এখন কোটিপতি আমরা পথে-ঘাটে দেখছি। কোটিপতি শব্দটার সঙ্গে এ দেশে অবৈধ কথাটা জড়িত। কারণ এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, জমি দখল, নানাবিধ দখলের মাধ্যমে কোটিপতিদের জন্ম। কিন্তু আপনি এ দলে যেতে পারছেন না। আপনি সন্ত্রাসী নন, রাজনীতি করেন না, কিভাবে এখন কোটিপতি হবেন? অথবা সফল ব্যক্তি হবেন? আমরা ঘন তমশায় একজন সৃজনশীল শ্রমি মানুষের কথা বলার চেষ্টা করছি। তার নামের মূল্যই অনেক উঁচুতে ধার্য করা হয়- টমি মিয়ার সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন **বদরুদ্দোজা বাবু**

# টমি মিয়ার কোটিপতি হবার রেসিপি

কোটিপতি। নামের অথবা পরিচয়ের আগে অনেকেই এই বিশেষণটা অর্জন করতে চান। কিন্তু করতে পারেন না। কোটিপতি হওয়াটা আসলে কোনো পেশা নয়, হতে পারে না, লক্ষ্য হতে পারে কোনো একটি পেশায় সফল হওয়া। অর্থ উপার্জন অনুষঙ্গ হিসেবেই আসবে।

বিল গেটস আজকের অবস্থানে এসেছেন তার স্বপ্নের কারণেই। মাইক্রোসফটের স্বপ্নই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বিশ্বের এক নম্বর কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের কর্ণধার হিসেবে, এবং শীর্ষ ধনী ব্যক্তিতে। 'আপনার স্বপ্নই আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।' বিল গেটসের বক্তব্য এমন। এতদূর chš ¯c অনেক ক্ষেত্রে অলীক মনে হয়। মনে হতে পারে তিনি তো আমেরিকায় জন্ম নেয়া একজন। এখানে তা কীভাবে সম্ভব?

এবার একটা অন্য উদাহরণ জানুন। বিশ্বখ্যাত বাঙালি শেফ টমি মিয়ার উত্থান একেবারে শূন্য থেকে। একদিনে তিনি আজকের অবস্থানে আসেননি। টমি মিয়াও **স্বপ্ন** দেখতেন। দারিদ্র্যকে অতিক্রম করার স্বপ্ন। ধনী ব্যক্তি হবার। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার। টমি মিয়ার সেই স্বপ্ন এখন সত্যি। দেশ-বিদেশে তার নাম, সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে আয় করেছেন অনেক অর্থ। হয়েছেন ধনী ব্যক্তি। মৌলভীবাজারের বারনাথি গ্রামের টমি মিয়ার সঙ্গে আজকের টমি মিয়ার পার্থক্য বিশাল। কীভাবে হলেন তিনি আজকের টমি মিয়া।

সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৩ সংখ্যা ২০ প্রচ্ছদ কাহিনী 'কোন বানেগা ক্রোড়পতি'তে দেয়া হয়েছিল কোটিপতি হবার কয়েকটি শর্টকাট ফর্মূলা। দেখানো হয়েছিল ক্ষমতা কিভাবে একশ্রেণীর মানুষকে এখানে কোটিপতি বানায়। বাংলাদেশে কিছু মানুষ এখন খোঁজে কোটিপতি হবার পথ রাজনীতি করে, সন্ত্রাসী হয়ে। ব্যাংক ঋণখেলাপি হয়ে সমাজপতি হয়ে বসেন। টমি মিয়া এদের সারিতে নয়। এটা একজন শ্রমি, স্বপ্নদেখা মানুষের কথা। টমি মিয়া দিয়েছেন অন্য ধরনের রেসিপি। নতুন রেসিপি।

টমি মিয়া লন্ডন যান ১৯৬৯ সালে। বয়স তখন মাত্র দশ। সিলেট থেকে সোজা পাড়ি জমান ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম। সেখানে টমির বাবা থাকতেন। বাবা বিদেশে থাকলেও টমিদের অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। দেশের অন্য ৮-১০টি গরিব পরিবারের মতো একটি ছিলো। বাবা সেখানে একটি

মেটাল ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। নিজের খরচের টাকা, দেশে পরিবারের খরচ তাদের দেখতে আসা- সামান্য বেতনের চাকরি করে টমির বাবাকে এসব খরচ, জোগাতে হিমশিম খেতে হতো। সিদ্ধান্ত নেন টমি মিয়া ও তার মাকে ইংল্যান্ডে নিয়ে আসার। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবস্থাও করে ফেলেন। টমি মিয়া আর তার মা স্থানান্তরিত হন বার্মিংহামে।

টমি মিয়া বলেন, 'যখন আমি ইংল্যান্ড যাই ক্লাস থ্রি'র ছাত্র ছিলাম। দেশে বাবা প্রতি মাসে টাকা পাঠাতো। কিন্তু টাকা পাঠানো, দেশে আমাদের দেখতে আসা- এ সবই বাবার জন্য ছিল ঝামেলার। তার চেয়ে যদি আমরা পুরো পরিবার লন্ডন বা বার্মিংহাম থাকি তাহলে একসঙ্গে থাকা যাবে এবং খরচও কিছুটা বাঁচবে। এ ধরনের চিন্তাভাবনা থেকে হয়তো আমাকে আর মাকে ইংল্যান্ড নিয়ে গিয়েছিলেন।'

ইংল্যান্ড যাবার পরও তাদের পরিবারের অবস্থা খুব একটা যে ভালো হলো তা নয়। বলা চলে দিন এনে দিন খাওয়ার মত অবস্থা। উদ্বৃত্ত বলে কিছু থাকতো না। টমির পড়ালেখার খরচ, বাড়ি ভাড়া, খাবার খরচ এসব তার একার পক্ষে জোগানো সম্ভব ছিল না। সংসার চলছিল কিন্তু সচ্ছলতা বা আনন্দ বলে কিছু ছিল না। বিদেশ যাবার কয়েক বছর পরই টমি মিয়া বুঝতে পারলেন এভাবে চলবে না। তার কিছু একটা করা দরকার। সংসারে বাড়তি আয়ের প্রয়োজন। অন্তত পক্ষে নিজের খরচ চালানোর টাকা রোজগার করতে হবে- এ ধরনের চিন্তা করতে থাকলেন টমি মিয়া। স্টার অব বেঙ্গল রাজ নামে একটি বাঙালি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম একটি চাকরি নেন টমি মিয়া। ক্লিনিংয়ের কাজ করতেন সেখানে। 'কি করবো, কেমনে করবো, এতো নিচু মানের কাজ এমন ধরনের কোনো চিন্তাভাবনা তখন করিনি। কিছু একটা করতে হবে শুধু সংসারের জন্য এটাই জানতাম।'

সপ্তাহে দুই রাত রেস্টুরেন্টে ক্লিনিংয়ের জন্য যেতে হতো টমি মিয়াকে। এই দুই রাতের আয় ছিল ২৫০ টাকা। টমি মিয়ার জীবনে এটাই ছিল প্রথম উপার্জন। রেস্টুরেন্টের কাজটি তিনি করতে থাকেন। সপ্তাহে ২৫০ টাকা করে পেতে থাকেন। স্কুলের খরচ রেখে বাকি টাকা তুলে দিতেন মায়ের কাছে। আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে স্বপ্নের পরিধি। ক্লিনিংয়ের কাজে পয়সা কম ছিল। টমি মিয়ার স্বপ্ন ছিল বড়। রেস্টুরেন্টে চাকরি করতে করতেই টমি মিয়ার আগ্রহ জন্মে রেস্টুরেন্ট ব্যবসার প্রতি। তৈরি হয় নতুন স্বপ্ন। পরিকল্পনা হিসেবে বেছে নেন ফুড ও কুকিংয়ের ওপর নিজেকে দক্ষ করে তুলবেন। টমি বলেন, 'রেস্টুরেন্টে ক্লিনিংয়ের কাজ করার পর আমি কুকদের রান্না দেখতাম। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার আগ্রহ দেখে তারাও আমাকে কাছে ডাকতো। আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমি কুকিংয়ের কাজ শিখবো। আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল আমি পারবো। ভালোই পারবো।'

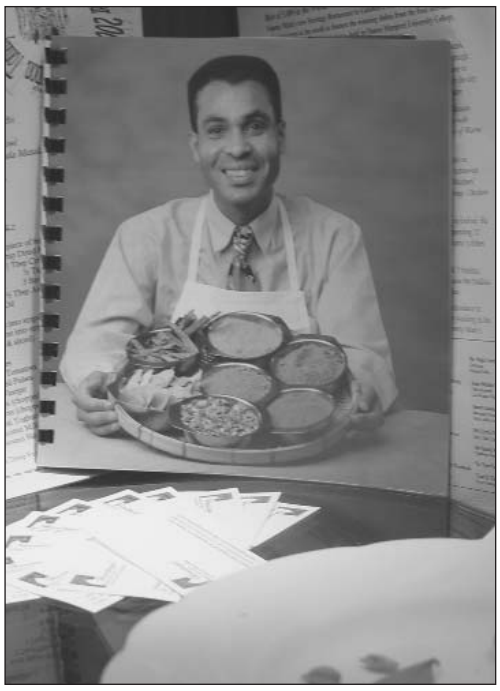

**স্টার অব বেঙ্গল রাজ নামে একটি বাঙালি রেস্টুরেন্টে পার্টটাইম একটি চাকরি নেন টমি মিয়া। ক্লিনিংয়ের কাজ করতেন সেখানে। 'কি করবো, কেমনে করবো, এতো নিচু মানের কাজ এমন ধরনের কোনো চিন্তাভাবনা তখন করিনি। কিছু একটা করতে হবে শুধু সংসারের জন্য এটাই জানতাম'**

আত্মবিশ্বাস একটি বড় ব্যাপার। আমি পারবো কিংবা পারতে হবে এমন ধরনের মানসিকতা থাকতে হবে। টমি মিয়ার মধ্যে সেটি ছিল। একটি কাজে **নিজের ওপরে আত্মবিশ্বাসটা** জরুরি। আপনি যদি মনে করেন আপনি কাজটি পারবেন তাহলেই আপনি পারবেন। টমি মিয়ার কথাই ধরুন। তিনি দেখেছিলেন এই পেশায় ভবিষৎ ভালো। পরিশ্রম করে লেগে থাকলেই হলো। উপরে ওঠা যাবে খুব সহজে। সেজন্যই টমি মিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন এই পেশায় তিনি তার ভবিষ্যৎ গড়বেন। প্রথম তার সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মাকে। ছেলের এতো আগ্রহ দেখে টমির মাও অমত করলেন না। তিনি টমিকে বেশ কিছু বাঙালি রান্না শেখালেন। টমি মিয়াও শিখে নিলেন হুবহু করে । অর্থাৎ আমরা দেখছি টমি মিয়া প্রথম একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই পথে এগুতে চাচ্ছেন। তার জন্য বিষয়টাকে ভালোভাবে আয়ত্তে আনছেন। প্রথমে যে কাজটি টমি মিয়া করেছিলেন সেটা হলো, রেস্টুরেন্টের কিচেনে যারা কাজ করতো তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। তারাই প্রথম টমি মিয়াকে অনেক কাজ দেখিয়ে দেয়, শিখিয়ে দেয়। ক্লিনিংয়ের কাজ শেষে মাঝে মাঝে শেফদের সঙ্গে রুটি বানাতেন। তিনি যে কিছু কিছু রান্না করতে পারেন সে কথাও জানিয়েছেন এই সুযোগে। তারাও টমি মিয়ার আগ্রহ দেখে বিভিন্ন ধরনের রান্না শেখাতে থাকেন।

১৯৭৩ সালের কথা। টমি মিয়ার বয়স তখন ১৪। এভাবেই তিনি কুকিংয়ের বেসিক সব বিষয়গুলো জেনে নেন স্টার অব বেঙ্গল রেস্টুরেন্টের শেফদের কাছ থেকে। মায়ের শিক্ষা তো আছেই। টমি মিয়া তার এই আত্মবিশ্বাস সম্পর্কে বলেন, 'আপনাকে ভাবতে হবে যে, আপনি এই কাজটি পারবেন। 'পারবো' এই 'Will'টাই আপনাকে অনেকদূর নিয়ে যাবে। ইউ হ্যাভ টু বিলিভ ইউ ক্যান ডু ইট। আর যদি আত্মবিশ্বাসী না থাকেন তাহলে বলবো, You should n't do or don't do it' এই আত্মবিশ্বাসের কারণে টমি মিয়া খুব অল্প সময়ে রেস্টুরেন্টের একজন শেফ হয়ে যান। হোটেল মালিকও তখন বুঝে যান এই ছেলের আগ্রহ আছে, ওকে দিয়ে হবে। প্রমোশন দেন শেফ হিসেবে বেতনও বেড়ে যায়। সপ্তাহে ৬ দিন কাজের জন্য তখন পেতেন বাংলাদেশী টাকায় দেড় হাজার টাকা।

শুধু স্বপ্ন বা আত্মবিশ্বাসই টমি মিয়াকে ক্লিনার থেকে শেফ বানায় নি। ছিল টমির কঠোর পরিশ্রম এবং ছিলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আত্মবিশ্বাসী হবার পাশাপাশি কাজটি করার ব্যাপারে আপনার **সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা** থাকতে হবে। থাকতে হবে **পরিশ্রম করার মানসিকতা**। টমি মিয়া কুকিংয়ের কাজ শেখার জন্য অনেক সময় দিয়েছেন। পাশে পাশে থেকেছেন শেফদের। পরিশ্রম করেই তিনি শিখেছেন রান্নার যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো। ভিতরের রহস্যগুলো।

শেফ হবার পর টমি মিয়া পরিবারসহ

দেশে এসে বিয়ে করেন। সিলেটের মেয়ে রানীকে বিয়ে করে লন্ডনে নিয়ে আসেন। টমি মিয়া বলেন, 'বিয়ে করার পর দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেল। তখন শেফ হিসেবে যে টাকা পেতাম তা আর যথেষ্ট মনে হলো না। বাড়তি রোজগারের জন্য একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ নিলাম। সেখানে পুতুল তৈরি হতো। সাপ্তাহিক ছুটি বলে তখন আমার কিছু ছিল না। পরিশ্রম করতাম অনেক। আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে।'

আজকের টমি মিয়া হবার পেছনে তিনি বার বার বলেছেন, তার স্ত্রীর কথা। টমি মিয়ার স্বপ্ন ছিল একদিন তিনি নিজে একটি রেস্টুরেন্ট চালাবেন। বিয়ে করার পর টমির স্বপ্নই তার স্ত্রী ধারণ করেন। পথ দেখান রানী। তিনি বলেন, সঞ্চয়ের কথা। টমি মিয়ার কাছে সামান্য কিছু জমানো টাকা ছিল কিন্তু তার রেস্টুরেন্ট দেবার মত নয়। কি করা যায়? -এমন চিন্তা করতে করতেই এক সময় তার মাথায় এলো 'Take away food shop'-এর কথা। এ ধরনের দোকানে খাবার পাওয়া যায়, বসে খাবার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। টমি মিয়া ও তার স্ত্রী মিলে দোকান খোঁজা শুরু করলেন। খুঁজতে খুঁজতে একটি জায়গা ভাড়া পাওয়া গেল। নিচে ছোট একটি দোকান, উপরে দুটি বেডরুম। তাদের দু'জনেরই বাড়িটা পছন্দ হলো। সপ্তাহে ১২ পাউন্ড ভাড়া। আর দোকান সাজাতে খরচ হলো ৭০০ পাউন্ডের মতো। এটাই ছিল টমি মিয়ার নিজের প্রথম উদ্যোগ। একেবারেই নিজের চাকরি ছেড়ে নিজেই শুরু করেন ব্যবসা। এখানেই টমি মিয়া 'রিস্ক' নেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন চাকরি করে কখনো তার স্বপ্ন পূরণ হবে না। ঝুঁকি নিয়েই তিনি কোটিপতির পথে যাত্রা শুরু করলেন। টমি মিয়া বলেন, 'আপনি যদি বড় হতে চান **রিস্ক আপনাকে নিতেই হবে**। আমি কিন্তু চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম। Take away food shop' কিন্তু আমার টার্গেট ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল একটি রেস্টুরেন্ট দেয়ার। যখন দেখলাম আমার অত টাকা নেই, তখন এ ধরনের দোকান দিলাম। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় এর আয়ও খারাপ ছিল না। এই দোকান থেকেই আমি রেস্টুরেন্ট করার মূলত সাহস পাই।'

টমি মিয়ার ছোট্ট এই দোকানটি ভালো চলতো। স্বামী-স্ত্রী মিলে সারাদিন এই দোকানের পেছনে সময় দিতেন। কীভাবে দোকান ভালো চলবে- এর পথই খুঁজতেন দু'জন মিলে এবং তারা পরিশ্রম করেই সফল হলেন। প্রতি সপ্তাহে সব খরচ বাদে টমি মিয়ার স্ত্রীর হাতে ৫০-৬০ পাউন্ড থেকে যেত। তারা দু'জনে মিলে ঠিক করেন, যেভাবেই হোক প্রতি সপ্তাহে ৫০ পাউন্ড সঞ্চয় করবেন। কোনো সপ্তাহে দেখা যেত ৫০ পাউন্ডের কিছু কম হয়েছে তখন পরের সপ্তাহে সেটা পূরণ করে রাখতেন। দোকানের বিক্রিও বাড়তে থাকলো, দোকানটিও পরিচিত হয়ে উঠলো ভালো খাবারের দোকান হিসেবে। শ্রম শুধু নয়, শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে হবে প্রতিযোগিতামূলকভাবে। এই একসেলেন্সই একটি মূলধন। যা বাড়তে থাকে। মানুষের ভিড় প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে, সেই সঙ্গে সঞ্চয়ের পরিমাণ। তিন বছর পর এই দম্পতির কাছে ৬ হাজার পাউন্ডের মতো জমে গেল। এখন একটি ছোটখাটো রেস্টুরেন্ট দেয়ার জন্য টমি মিয়া দম্পতি তৈরি। এমন সময় টমি মিয়ার কাছে একটি বড় রেস্টুরেন্ট করার প্রস্তাব এলো। টমি মিয়া বলেন, 'স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গে আমার স্ত্রীর এক বোনের জামাই ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দিলেন, তার সঙ্গে সেখানে শেয়ারে রেস্টুরেন্ট খোলার। আমিও দেখলাম বার্মিংহাম বা লন্ডন রেস্টুরেন্ট করার জন্য খুব এক্সপেনসিভ। আমি চলে গেলাম স্কটল্যান্ড। সেখানে চারজন মিলে আমরা ***বারান্দা*** নামে একটি রেস্টুরেন্ট চালু করি ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। আমি আর আমার স্ত্রীর বোনের জামাই ছিলাম ওয়ার্কিং পার্টনার। পুরো রেস্টুরেন্টে আমরা বাংলাদেশকে প্রমোট করি।' টমি মিয়া বললেন, 'প্রতিযোগিতায় যেতে হলে, শ্রেষ্ঠত্বে উঠতে হলে আমার ভাবতে হবে আমি নতুন কি দিচ্ছি। আমি ভালোভাবে বাংলাদেশের রান্না চিনি, সে দিকেই যেতে হবে। এ জিনিসটা এদের কাছে হবে নতুন।'

বারান্দা করতে লেগেছিল মোট ৪০ হাজার পাউন্ড। অন্য তিন জনের সঙ্গে টমি মিয়ারও ইনভেস্টমেন্ট ছিল ১০ হাজার পাউন্ড। সেই সঙ্গে প্রধান শেফ হিসেবে সপ্তাহে বেতন পেতেন ৩০০ পাউন্ড। একে তো ব্যবসার লাভের টাকা তার ওপরে বেতন- টমি মিয়ার আয় বেড়ে যায় কয়েকগুণ। তিনি বুঝতে পারলেন, তিনি তার স্বপ্নকে ছুঁতে যাচ্ছেন।

এই সময় টমি মিয়ার হাতে বেশ কিছু টাকা জমতে শুরু করলো। বেতন ও রেস্টুরেন্টের টাকা মিলিয়ে বেশ কিছু টাকা প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় করতে পারতেন এই দম্পতি। এই সময় টমি মিয়া রেস্টুরেন্ট ব্যবসার পাশাপাশি প্রোপার্টি ব্যবসায় নামেন। পুরনো বাড়ি কিনে মেরামত করে ভালো দামে বিক্রি করে দেয়াই ছিল টমি মিয়ার ব্যবসা। টাকাটা ফেলে না রেখে সে টাকা ব্যবহার করলেন শ্রম দিয়ে, মেধা দিয়ে। বারান্দা রেস্টুরেন্ট ও প্রোপার্টি ব্যবসা টমি মিয়াকে কোটিপতি বানিয়ে দেয়। পাশাপাশি তার সুনামও বাড়তে থাকে। পরিচিতি পান ভালো শেফ হিসেবে। তেমনি বাড়তে থাকে ব্যবসাও। এ বিষয়ে টমি মিয়া বলেন, 'আমি সব সময়ই খুব সাধারণভাবে চলেছি। আমি কখনোই মনে করিনি আমি বিরাট বড় একজন। তবে এটা ঠিক, '৮৭ সালের দিকে আমি প্রচুর টাকা আয় করেছিলাম। আমার ব্যবসা তখন ভালো চলছিল।'

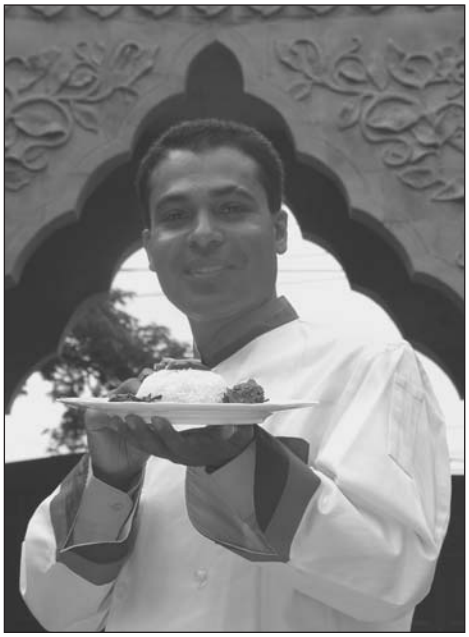

**প্রতি সপ্তাহে সব খরচ বাদে টমি মিয়ার স্ত্রীর হাতে ৫০-৬০ পাউন্ড থেকে যেত। তারা দু'জনে মিলে ঠিক করেন, যেভাবেই হোক প্রতি সপ্তাহে ৫০ পাউন্ড সঞ্চয় করবেন। কোনো সপ্তাহে দেখা যেত ৫০ পাউন্ডের কিছু কম হয়েছে তখন পরের সপ্তাহে সেটা পূরণ করে রাখতেন**

নিজেকে তুলে ধরার জন্য টমি মিয়া বলেছেন সৃজনশীলতার কথা। বলেছেন, 'ক্রিয়েটিভিটির বিকল্প নেই। অন্যদের তুলনায় আপনার পার্থক্য বোঝা যাবে এই **সৃজনশীলতা** দিয়ে।' এডিনবার্গে টমি মিয়াদের বারান্দা রেস্টুরেন্টটি ৫-৬ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সুস্বাদু খাবারের কারণেই নয়, এখানে অন্য কিছুও ছিল। বারান্দার খাবারের গন্ধ চারপাশেই ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও রেস্টুরেন্টটিতে বাংলাদেশকে তুলে ধরা হয়েছিল সুন্দরভাবে। শীতল পাটি, নকশিকাঁথা দিয়ে দোকানটি সাজানো হয়েছিল। এসব ছাড়া দোকানটি

জনপ্রিয় হবার অন্যতম কারণ ছিল **'জনসংযোগ'**। টমি মিয়া বলেন, 'খাবারের কোয়ালিটি তো মাস্ট। এটা থাকতেই হবে। তাছাড়া পাবলিক রিলেশনেরও কিছু বিষয় থাকতে হবে। আপনাকে অবশ্যই কমিউনিকেটিভ হতে হবে। আপনি যে পেশা বা যে কাজই করেন না কেন, জনসংযোগ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। **মিডিয়া সাপোর্ট** আপনার লাগবেই। আজকের টমি মিয়া সম্পর্কে আপনারা জানতে পারছেন মিডিয়ার কারণে। দেশে প্রথম আমাকে তুলে ধরেছিল শাহাদত চৌধুরী সম্পাদিত অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা।

দেখতে হবে যাতে বিখ্যাত তারকারা এই রেস্টুরেন্টে খেতে আসেন। মিউজিক তারকা ক্লিভ রিচার্ড, টেনিস খেলোয়াড় ম্যাকেনরো এরা সবই বারান্দাতে যান খাবারের স্বাদ নিতে। বিখ্যাত ব্যক্তিদের আগমনে শুধু স্থানীয় কমিউনিটি নয়, নগরের সবার কাছে রেস্টুরেন্টটি আগ্রহের বিষয় হয়ে ওঠে। রেস্টুরেন্টে খেতে আসা স্কটল্যান্ডের এক সাংবাদিকের সঙ্গে পরিচয় হয় টমি মিয়ার। তাকে দায়িত্ব দেয়া হয় রেস্টুরেন্টর জনসংযোগ ও মার্কেটিংয়ে। এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে টমি মিয়া রেস্টুরেন্টের মার্কেটিং কীভাবে করতে হয় জানতে পারলেন।

টমি মিয়া তার এতো নাম, যশ, টাকা পয়সা হওয়ার পেছনে একটি কারণের কথা বার বার বলেছেন, সেটি হচ্ছে **'ফোকাস'** থাকা। টমি মিয়া বলেন, 'ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ ফোকাস। আপনার সব সময়ই ভাবতে হবে এখানেই শেষ নয়। আরো যেতে হবে- অনেক দূর। টার্গেট থাকতে হবে একটার পর একটা। ভবিষ্যৎকে যদি আপনি না বুঝতে পারেন তাহলে আপনি উপরে উঠতে পারবেন না।'

এরপরের কয়েক বছর বারান্দা রেস্টুরেন্টটি ভালো চললো। কিন্তু অন্য পার্টনাররা অন্যান্য ব্যবসায় মনোযোগী হবার কারণে রেস্টুরেন্টটির কোয়ালিটি আর আগের মতো সে রকম থাকলো না। ব্যবসার অবস্থাও খারাপ হতে লাগলো। টমি মিয়া সিদ্ধান্ত নিলেন বারান্দা ছেড়ে দেয়ার। কারণ তার হাতে তখন একেবারে সম্পূর্ণ নিজের টাকা দিয়ে রেস্টুরেন্ট দেবার মতো যথেষ্ট টাকা ততদিনে জমে গিয়েছিল। পার্টনারদের সঙ্গে কথা বললেন, পার্টনাররা টমি মিয়ার মতামতকে সমর্থন করে তাকে যেতে দিলেন।

## কোটিপতি হবার রেসিপি

### মাল-মসলা

১. স্বপ্ন- কি করতে চাই, কোথায় যেতে চাই
২. আত্মবিশ্বাস
৩. টার্গেট নির্ধারণ- কি হতে চাই
৪. বিষয়টি জেনে নেয়া, খুব ভালোভাবে
৫. পরিকল্পিত পথ
৬. ঝুঁকি নেয়া সাহস করে
৭. প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব। একসেলেন্স
৮. সৃজনশীলতা
৯. গণসংযোগ। মিডিয়ায় যাওয়া। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়া
১০. ফোকাস নির্ধারণ। ফোকাসে থাকা
১১. কিছু পরিমাণে গিমিক, চমক!
১২. পরিশ্রম, পরিশ্রম ও পরিশ্রম প্রচুর পরিমাণে!

স্কটল্যান্ডের এডিন-বার্গে একটি পরিত্যক্ত স্ট্রিট ছিল। এক সময় পতিতারা সেখানে থাকতো। লোকজনেরও আগ্রহ ছিল না এ স্ট্রিটের বিল্ডিং কিংবা জমির প্রতি। সেখানকার একটি বিল্ডিং টমি মিয়া কিনে ফেলেন। মেরামত করে ভবনটি সাজান সুন্দরভাবে। চারপাশে তৈরি করেন দেশী আবহাওয়া। এই শহরে পুরনো এতো রেস্টুরেন্টের মধ্যে নতুন একটি রেস্টুরেন্টে মানুষ কেন আসবে? এ চিন্তা সব সময়ই ছিল টমি মিয়ার। তিনি বলেন, 'আমি এমন একটা কিছু খুঁজছিলাম যাতে আমার রেস্টুরেন্টটি সবার চোখে পড়ে, মিডিয়াতে যাতে কভারেজ পাই। আমি জানতাম রেস্টুরেন্টে একবার যারা খেতে আসবে তারা পরবর্তীতেও আসবে। কারণ আমার রান্না ভালো। কিন্তু এই একবার আনার জন্য, প্রথমবারের জন্য, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় কীভাবে?' হঠাৎ খুঁজে পেলেন অন্য রকম একটি আইডিয়া। রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করালেন একটি হাতি

দিয়ে। বিখ্যাত হাতি দিয়ে। গান্ধী সিনেমায় সার্কাসের যে হাতিটা দেখানো হয়েছিল সেটিকে সাজিয়ে প্যারেড করে নিয়ে আসা হয় তার রেস্টুরেন্টে। শত শত শিশুকিশোর রাস্তায় হেঁটে যাওয়া হাতি দেখতো। তার এই আইডিয়াটা সফল ছিল। মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজ পেলেন তিনি। নানা অঞ্চল থেকে লোকজন একবারের জন্য হলেও তার রেস্টুরেন্টে ঘুরে গেছেন। নিজের রেস্টুরেন্ট দেবার পরও টমি মিয়া কিন্তু 'চিফ শেফ' হিসেবে সেখানে ছিলেন। রান্না নিজেই দেখিয়ে দিতেন। প্রয়োজন হলে করতেন। কারণ তিনি জানতেন এটাই তার ব্যবসার মূলমন্ত্র। এখানে কম্প্রোমাইজ করা চলবে না।

টমি মিয়ার হাতে তখন টাকা আসছে বড় আকারে রিয়েল এস্টেট থেকে। কিন্তু তিনি টাকা নিয়ে আরাম-আয়েশি জীবন বেছে নিলেন না। নিজেকে ব্যবসায়ী বলে পরিচিত করলেন না। কারণ তিনি জানতেন ফোকাসে থাকতে গেলে 'শো ম্যান' হতে হবে। শো ম্যান হতে হলে ব্যবসায়ী হলে চলবে না। হতে হবে প্রফেশনাল। যে জন্য তিনি অনেকের মতো 'শেফ' পরিচয়টা বাতিল না করে সেক্ষেত্রে 'শো ম্যান' হয়ে উঠলেন। বুঝতে পারলেন এই পরিচয়ই তাকে ফোকাসে রাখবে। এ সময় তিনি সবচেয়ে বড় হাঁড়িতে 'কারি' রান্না ওয়াল বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নিজের নাম ওঠালেন। পৃথিবীর বড় কারি কুক হিসেবে। রাজবাড়ির জন্য 'কারি' তৈরি করলেন। এখান থেকে নাম বিক্রি হওয়া শুরু হলো। টমি মিয়ার রেসিপি বলে কেউ আচার বাজারে ছাড়লো, কেউ পানীয়। অনেক কুক্ড ফুডের প্যাকেটে টমি মিয়া তার নাম জুড়ে শেয়ার পেলেন।

এরপর টমি মিয়া শুধু এগিয়ে চলেছেন। এখনও চলছেন। মার্কেটিং, পাবলিশিং, অ্যাডভার্টাইজিং সব ধরনের ব্যবসাই করেছেন, করছেন তিনি। এডিনবার্গে দ্য রাজ হোটেলটি বেশ নাম করে। পরবর্তীতে তিনি রেস্টুরেন্টের পাশাপাশি ১৭ রুমের হোটেলেও রূপ দেন। পাশাপাশি সব ব্যবসায় সাফল্য পেতে শুরু করেন। এতো সব করার পরও তিনি দেশের কথা ভোলেননি। তিনি বলেন, 'আমি সব সময় চেয়েছি বাংলাদেশকে প্রমোট করতে। আমার রেস্টুরেন্ট, হোটেল সব কিছুতে। '৮৭ সালের পর দেশে এসে যখন দেখতে পেলাম সারা ঢাকা ছেয়ে গেছে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে তখন খুব খারাপ লাগলো। আমি তখন দেশে এসেছিলাম ঢাকার একটি এতিমখানার শিশুদের সাহায্য করতে। সারা দেশে এতো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট দেখে আমি খুব অবাক হলাম। স্কটল্যান্ড ফিরে গিয়ে একটি দেশী রেসিপি বই লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।'

ব্রিটিশ এয়ারলাইন্সের স্পন্সরে টমি মিয়ার লেখা রেসিপি বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। সব রেসিপি ছিল বাংলাদেশী। সাধারণত এ ধরনের বই কেউ লিখলে জেনারেলাইজ করে নাম দেয় 'কুক বুক অব ইন্ডিয়া' বা 'ইন্ডিয়া ফুড' ইত্যাদি কিন্তু 'দ্য বেস্ট অব বাংলাদেশ' নামে রেসিপি বইটি ছিল টমি মিয়ার প্রথম রেসিপি বই। দেশে-বিদেশে প্রচুর বিক্রি হলো বইটি। প্রচুর টাকাও পেলেন সেখান থেকে। বই বিক্রির সব টাকা তখন তিনি গাজীপুরের এতিমখানায় দান করেন। এসবই তার জন্য সুনাম বয়ে নিয়ে আসে। মিডিয়া কাভারেজ আসে।

টমি মিয়ার ব্যবসা এখন সব দেখাশোনা করছেন তার পরিবার। তার স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা মিলে ব্যবসা চালাচ্ছে। বছরে কয়েকবারই এখন বাংলাদেশে আসেন। এই রিপোর্টের জন্য তার সঙ্গে কথা হয় একটি নতুন পাঁচ তারকা রেস্টুরেন্টে বসে। গুলশানের এই রেস্টুরেন্টের বয়স পাঁচ মাস। চারজন পার্টনারের মধ্যে তিনি একজন। এই রেস্টুরেন্টে ইনভেস্টমেন্ট অনেক। আমরা যখন জিজ্ঞেস করি আপনার 'ইনভেস্টমেন্ট' কি? টমি মিয়া বললেন, আমার নাম। তিনি এই রেস্টুরেন্টের পরামর্শদাতা। টমি মিয়ার রেস্টুরেন্ট হ্যারিটেজ এখন পরিচিতি পেয়েছে। রান্না থেকে শুরু করে রেস্টুরেন্টের সব বিষয় দেখেশোনার চেষ্টা করেন তিনি। এখন টাকা নয়, টমি মিয়ার নামই একটি বিরাট বড় ব্যাপার।

টমি মিয়া কিন্তু এখনও এখানেই থেমে নেই। তিনি এখনো স্বপ্ন দেখেন। তার ফোকাস খুব পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'আমার এখন ইচ্ছা দেশে একটি হসপিটালিটি এন্ড ক্যাটারিং ইনস্টিটিউট খোলা। সেখানে ট্রেনিংয়ে ব্যবস্থা থাকবে। আমাদের এখানে প্রচুর হোটেল আছে, রেস্টুরেন্ট আছে কিন্তু এই সার্ভিসের দিকটায় এখনো অনেক দুর্বল। ভালো প্রশিক্ষকের প্রয়োজন হলে আমি ইংল্যান্ড, আমেরিকা কিংবা ফ্রান্স থেকে প্রশিক্ষক নিয়ে আসবো ট্রেনিংয়ের জন্য। ক্যাটারিং, হোটেল ম্যানেজমেন্ট এখন সারা বিশ্বে জনপ্রিয়। আমরা কেন পিছিয়ে থাকবো? আমার ইচ্ছা, আগামী দুই বছরের মধ্যে এটি শুরু করা যাবে।'

**রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করালেন একটি হাতি দিয়ে। বিখ্যাত হাতি দিয়ে। গান্ধী সিনেমায় সার্কাসের যে হাতিটা দেখানো হয়েছিল সেটিকে সাজিয়ে প্যারেড করে নিয়ে আসা হয় তার রেস্টুরেন্টে। শত শত শিশুকিশোর রাস্তায় হেঁটে যাওয়া হাতি দেখতো। তার এই আইডিয়াটা সফল ছিল। মিডিয়ায় ব্যাপক কভারেজ পেলেন তিনি**

একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে টমি মিয়া আরো সামনে এগোতে চান। নিতে চান নতুন উদ্যোগ। নতুন প্লাটফর্ম তৈরি করতে চান। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নতুন নতুন স্বপ্ন দেখেছেন। নতুন দিগন্ত খুলেছেন নিজের জীবনের। এখন তার নামই বিক্রি হয় অনেক দামে। টমি মিয়া শুধু কোটিপতি না, নামটার দামও কোটি টাকা। এটা তাকে অর্জন করতে হয়েছে।

আপনিও দেখুন স্বপ্ন, বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতেই। তবে এখানে টমি মিয়ার মত সে ধরনের সুযোগ না পেলেও আপনি পরিশ্রম করেই সেগুলো অর্জন করতে পারেন। পাঁচ বছর, দশ বছর পর নিজেকেই দেখবেন অন্য এক অবস্থানে। প্রথম কোটি টাকা উপার্জন খুবই কঠিন। পরবর্তীতে টাকাই টাকা আনবে যদি আপনার নিষ্ঠা থাকে। তখন হয়তো অন্য এক স্বপ্ন রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। এটাই সফল মানুষের সফলতার কাহিনী এবং একই সঙ্গে রহস্য।

সহযোগিতায় **জব্বার হোসেন**